প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছা-৮

(মেজর, মাখন, মজু নামের বালকেরা আজ হতে ষাট বছর আগে গাজীপুরের এক গন্ডগ্রামে বনে বাদারে ঘুরে বেড়াত। সে ছিল এক প্রাগৈতিহাসিক কাল। সমাজে মানুষের পাশাপাশি জ্বিন-পরীদেরও অবাধ বিচরণ ছিল। জঙ্গলে বাঘ ছিল, হরিণ ছিল। আর ছিল ডোবা-নালা-বিল-হাওড়ভর্তি অজস্র মাছ। প্রাগৈতিহাসিক সেই সমাজ নগর-সভ্যতার অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে বহুকাল আগে; তবুও হারিয়ে যাওয়া সেই সময় এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায় মনের আকাশে। সেইসব প্রকৃতি-বালকদের রোজনামচার কিছু অংশ স্মৃতিবদ্ধ করার প্রয়াসেই অত্র উপাখ্যানগুলির অবতারণা।)

প্রেমের ফাঁদ

প্রেম শব্দটা আকারে আয়তনে ছোট, কিন্তু এর ভার অনেক বেশী। কী নাই এতে ? স্নেহ-ভালবাসা, রাগ-অনুরাগ, মায়া-মমতা সর্বকিছুই এই ছোট্ট শব্দটিতে ঠেসে ভরে দেয়া হয়েছে। এর গতি সার্বজনীন, আশী বছরের বুড়ো থেকে দশ বছরের বালক - সবার মনে এর অবাধ গতি। সুতরাং গাঙের পাড়ের মন্ডল বাড়ীর কাজিমুদ্দিন মন্ডল ওরফে কাজির মেয়ে ময়ফল যে গাঁয়ের বালককূলের ঘুম কেড়ে নেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কী ?

ময়ফল আমার সমবয়েসী। পরীর মতো চেহারা, গায়ের রং যেন কাঁচা হলুদ। মেয়েটি বড়ো মুখরা, ভাব জমাতে গেলে মোটেও পাত্তা দেয় না, খা খা করে উঠে। আমি রাজ্যের মুখচোরা, সমবয়েসী একটি মেয়ের সামনেও আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে, মুখচোখ লাল হয়ে আসে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে আমার সাথেই ময়ফলের ভাব হয়ে গেল। লাল মিয়া ধনী মানুষের পোলা, তার উপর দারুন সাহসী। অথচ লালমিয়া ময়ফলের সামনে গেলেই সে গালিগালাজ শুরু করে দেয়, দুই চোখে দেখতে পারে না।

সেদিন লালমিয়া বলল- 'চল্। গাঙের পাড়ে যাই, পাকড়া ফুল টুকামু'।

ঝরে যাওয় পাকড়া ফুলের বোটা নিয়ে খেলতে মজা, তবে জিনিষটা সব জায়গায় পাওয়া যায়। লালমিয়াদের বাড়ীর সামনেই দুই দুইটা পাকড়া গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। নিজের বাড়ীতে গাদা গাদা ফুল রেখে গাঙের পাড়ে ফুল কুড়াতে যাওয়ার পেছনে মারফতিটা কী ? লালমিয়া শয়তানের মত হেসে বলল- 'চল্। গেলেই দেখতে পাবি'।

একটা নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ মনকে অধিকার করে বসে, গুটি গুটি পায়ে লালমিয়াকে অনুসরণ করি।

বেশ কিছু ফুল কুড়ালাম, সুতোয় গেঁথে চমৎকার মালা হবে। অদুরেই ময়ফলদের বাড়ী। লালমিয়া বার বার সেদিকে তাকাচ্ছে। এমন সময় ময়ফলকে দেখা গেল, একটা ছোট্ট মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। ধারে কাছে কেউ নাই।

লালমিয়া ডাকল- 'এ্যাই ময়ফলি, একটু শুইনা যা'।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ময়ফল, তারপর গুটি গুটি পায়ে আমাদের কাছে আসল। বলল- 'কি কবি ক', আমার ম্যালা কাম'। লালমিয়া ফস্ করে বলে বসল- 'আমি তরে বিয়া করুম, আমার লগে বিয়া বসবি.....'?

ভুমিকা নাই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই - একেবারে নিখাত চাচাছোলা প্রেম নিবেদন। এবং কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কষে দৌড়। কষে দৌড়।

আমি অবাক, ময়ফল হতভম্ব ! এবং কিছুক্ষন পর কলসীটা ধপাস্ করে বালির উপর ফেলে রেখে কাঁদতে কাঁদতে ময়ফলও বাড়ীর দিকে হাটা দিল। -'ও মা'গো, হুন হারামজাদা গোলামের পুত আমাকে কী কইলো। ও মা'গো....'।

অবস্থা বেগতিক, এখানে থাকা আর নিরাপদ না। ময়ফলের কান্না শুনে ওর বাপ-ভাইয়েরা কেউ বেরিয়ে আসলে বিনাদোষে 'মাইর' জুটতে পারে কপালে। পশ্চিমে জমজমাট জেলে পাড়া, তাড়াতাড়ি তার আঁড়াল হই।

দুপুর বেলা মাখনার সাথে আলাপ হচ্ছিল। এখন মুক্তাহর ধান কাটার সিজন, ধানকাটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অনেক খেতই খোচা খোচা ধানের ডাটি বুকে নিয়ে খালি পড়ে আছে। সুবিধামত শুকনা ও খালি একটা খেত পেলে সেটাকে বল খেলার টেম্পোরারি ফিল্ড বানানো যায়। আমি ক্যাপ্টেন, খেত বাছাই করার দায়িত্ব আমার। যেতে যেতে মাখনাকে বললাম- 'চেঙ্গু, উত্তর পাড়ার বছুরদ্দি নানাগো

গাছে অনেক জাম্বুরা ধরছে। তুই যদি একটা জাম্বুরা আনতে পারস্, তরে সেন্টারে খেলতে দিমু। বাউইর বাসা দিয়া কম্পিটিশন জমে না'।
মাখন উৎসাহিত হয়ে বলল- 'হাচাই দিবা ? আমি তাইলে দুইটা জাম্বুরা আইনা দিমু'।
মাখনারে সেন্টারে খেলতে দিলে লোকমানদের দলের সাথে পারা মুশকিল হবে। লোকমানের পা' লোহার মতো শক্ত, বাড়ি লাগলে তিনদিন বিষ থাকে। তবুও উপায় নাই, মাখনাকে এই কনসেশনটুকু দিতেই হবে। মাখনা ছাড়া জাম্বুরা যোগাড় করা যাবে না, বছুরদ্দি ফকির মাখনার নানা হয়।
গোপিলা ভিটা পার হতেই দেখি ময়ফলি ছাগল চড়াচ্ছে। রোদে তার মুখটা লাল টুকটুকে হয়ে গেছে। আমাদের দেখে সে বলল- 'কই যাস্' ?

- 'কাম আছে'। আমার সংক্ষিপ্ত জবাব।
- 'হুইনা যা, এই খেতে একটা শিয়াল আছিল। আমারে দেইখা ছানাপোনা নিয়া দৌড় দিয়া জংগলে পলাইল'।

এটা 'হুনার' মতো কোন কথা হলো ? তবুও দাড়াতে হয়, হাজার হলেও ময়ফলকে তো আর অবজ্ঞা করা যায় না। সে যে সেদিনের সেই ঘটনার পরও আমার সাথে আগের মতো কথা বলছে তাতেই আমি কৃতার্থ।
বললাম- 'সাবধান। শিয়ালও কইলাম কুত্তার মতো পাগলা হইয়া যায়। পাগলা শিয়ালে কামড়াইলে প্যাটে বাচ্চা হয় তা জানস্ ? আমাগো কদমতলীর কালিমটর খেতে খুউব ঘাস হইছে। তর ছাগলরে খাওয়াইতে দিমু, যাবি'?

- 'ঈশ্ রে, শখ কতো। আমি অতদুর অখন ওনার লগে যাই, আর মায় আমারে ইচ্ছামত পিটুক'।
- 'তাইলে থাক একলা একলা, শিয়ালে কামড়াইব নি'.... বলে মাখনার সাথে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে যাই।

কদমতলীতে লালমিয়াদের বিশাল 'কলুই' খেত। কলাই গাছ প্রায় পেঁকে এসেছে। লালমিয়াদের চাকর ছাবেল এক পাশে গরুর খোটা গাড়ছে। তার সাথে লালমিয়াও আছে। আমাদের দেখে সে খুশী হয়ে বলল- 'কাইন্‌শা, আয় কলুই পোড়াইয়া খাই। আমার সাথে ম্যাচ আছে, বিড়িও আছে। কলুই পোড়া খাওয়ার পর বিড়ির যা স্বাদ। খাবি'?
লালমিয়া বিড়ি তামাকে এই বয়েসেই পেঁকে গেছে। আমি এখনও পারি না, টান দিলে মাথা ঘুরায়।
পোড়া কলাই খাওয়ার এক ফাকে লালমিয়াকে বললাম- 'হেদিন গাঙের পাড়ে তুই ময়ফলিরে খারাপ কথা কইলি, ময়ফলির বাপে নালিশ করে নাই'?
লালমিয়া বলল- 'খারাপ কথা কইলাম ! আমি ময়ফলিরে বড় হইলে বিয়া করুমই। ময়ফল রাজী আছে, কাইল কী হইছে জানস্'?

- 'কী হইছে'?
- 'কাইল দুপুরে দেখি ময়ফলি একা একা গোপিলা ভিটার কাছে। ধারে কাছে কেউ নাই। আমি তারে জাপটিয়া ধইরা চুমা দিছি। কিচ্ছু কয় নাই, একটুও বাধা দেয় নাই। আমি অখন সুযোগ পাইলেই অরে চুমা খামু- বুঝলি'?

বলে কি ! লালমিয়ার কথা শুনে আমি তাজ্জব হয়ে যাই, এত সাহস ওর ? সেই সাথে একটা দুরন্ত ক্রোধ এসে মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ময়ফলি সাংঘাতিক বদ্ তো ! আমার সাথে হেসে হেসে কথা কয় আর তলে তলে লালমিয়ারে চুমা খায় ! আমি লালমিয়ার চেয়ে খারাপ কীসে ? না হয় একটু গরীব আছি, কিন্তু দেখতে অনেক ভাল। লালমিয়া কুটকুটা কালো, আমি ধবধবা ফরসা। লেখাপড়ায়ও আমি লালমিয়ার চেয়ে অনেক ভাল। প্রায় দিনই আমি স্কুলে ওর কান মলি।
ময়ফলি এত বড় ভুলটা করল ! যাক্- জীবনেও অমন বদ্ মাইয়া মানুষের ছায়া মাড়ামু না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি বইগুলি চৌকির উপর ছুড়ে ফেলে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী হলো একটা ঝিনুক। সামান্য ঝিনুক না, পাটার উপর ঘসে ঘসে মাঝখানটায় যত্নের সাথে ছিদ্র করা হয়েছে। ছিদ্রের ধারগুলি মসৃন ও অসম্ভব ধারালো। কাঁচা আমের গায়ে লাগিয়ে টান দিলে খোসাগুলি উঠে আসে। সেই আমের সাথে লবন ও

কাঁচা মরিচের গুড়া লাগিয়ে যত খুশী খাও। আজ লেট হয়ে গেছে। এখনই গণি মন্ডলের আইলের পাড়ের আমতলায় যেতে হবে, সেখানকার 'আমঝৈল' খেলা এতক্ষনে বোধ হয় শ্যাষ হয়ে গেছে।
বেরুতেই দেখি হবি, আমার বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট হবিবউল্লাহ। সে খুবই উত্তেজিত ভাবে বলল- 'মেজর, সব্বনাশ হইছে। মজু, হানিফা ওরা সবাই মুন্নাফের দলে যোগ দিছে। তরে আমারে একঘরে করছে। ওরা সবাই অখন আমঝৈল খেলতাছে, আমারে খেলায় নিল না'।
কী সব্বনেশে কথা ! মুন্নাফ এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করল, আমার দলটাকে ভেঙে ছত্রনাশ করে দিল ! এখন উত্তর পাড়ার লোকমানগো দলের সাথে লড়বো কীভাবে ?

- 'মাখনা কই, ইউনুছ'? আমি বলি।
- 'মাখন অখনও চকে থেইকা ফিরে নাই। শীগগীর চল্ যাই, মাখনারে যেমনেই হউক আমাগো দলে রাখন লাগব। নইলে আমাগো দল অগো দল থেইকা ছোট হইয়া যাইব'।

কারেক্ট। তাড়াতাড়ি হবির সাথে বেরিয়ে পড়ি। বলি- 'তুই চিন্তা করিস্ না হবি। সামনের শনিবার বড়ভাই বাড়ী আসব। আমার লাইগা দুই নাম্বারি বল আনব কইছে, পাম্পার আর বাঁশীও আনব একটা। তখন দেখা যাইব, পায়ে ধরলেও মুন্নাফ মজুরে দলে নিমু না। দরকার হইলে পশ্চিম পাড়ার ধীরা সুভাষরে নিয়া টিম বানামু'।
হবিরে সান্ত্বনা দিতে মিছা কথা বলা ছাড়া উপায় নাই। বড় ভাই সামনের শনিবার আসবে ঠিকই, তবে আমার জন্যে বল আনার কোন সম্ভাবনাই নাই। নেতা হতে হলে অনেক মিথ্যাচার করতে হয়, ছোটবেলায়ই তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।
আইলের পাড়ে যাওয়া যাবে না, আমরা মোটে দু'জন। মারামারি লাগলে অসুবিধা আছে। পায়ে পায়ে তুরাগের দিকে রওনা দিলাম। বাপ্স্, কী মেলাই না বসেছে। নজরুল, ধীরেন, সিরাজ সবাই ধুমছে বলাই খেলছে। তপনটি নদীর পাড়ে খুলে রেখে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লাম আমরা। আহ্ শান্তি। ঝকঝকে বালি, ঠান্ডা কাকচক্ষু পানি আর ঝিরঝিরে স্রোত মুহূর্তে সব ক্লান্তি মুছে নেয়। শুধু মানুষ নয়, গরু মহিষ প্রভৃতি পশুরাও পানির মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। চার পাচটা মোষ সারা গা পানিতে ডুবিয়ে জল-ঋষির মতো ভেসে আছে, শুধু মাথাগুলি জেগে আছে। অনেকক্ষন ঝাপাঝাপি করলে ঘোর দুপুরেও শীত শীত করে, সুতরাং নদীর চরে গরম বালুর উপর শুয়ে শরীরটা গরম করছিলাম।
সিরা বলল- 'আয় দেখি কার চোখ বেশী লাল হইছে'।
অনেকক্ষন ডুব পারলে চোখ করমচার মতো লাল হয়, গা হয় ম্যাটম্যাটে। যার চোখ যত বেশী লাল হবে তার ক্রেডিট তত বেশী। তবে বেশী লাল হলে বাড়ীতে বকা খাওয়ার ভয়, সুতরাং এর হাত থেকে রেহাই পেতে একটি সহজ উপায় বের করেছি আমরা। বাড়ী যাওয়ার আগে একজন আরেক জনের কাছে যেয়ে বলবে- 'এই মাখনা, দেখি তর চউখ দেখি'।
মাখনা সাথে সাথে দুই আংগুল দিয়ে চোখের পাতা ফাক করে আমার চোখের সামনে তা মেলে ধরবে। সাথে সাথে আমাকে বলতে হবে- 'তর চোখে খুয়া নাই, আমার চোখে লাল নাই'। বাস্, সংগে সংগে আমার চোখ হতে লাল চলে যাবে। একই ভাবে মাখনাও আমাকে জিজ্ঞেস করবে এবং ওর চোখ হতেও লাল চলে যাবে।

ডুব-কাম সেরে সবাই দল বেঁধে বাড়ীর দিকে যাচ্ছি, এমন সময় অবাক কান্ড। কিয়ামুদ্দি সরকারের বাড়ী হতে গান ভেসে আসছে না ! অপুর্ব গলা, প্রাণকাড়া সুর। এমন গান একমাত্র বায়োস্কোপ ছাড়া আর কোথাও শোনা যায় না। গোবিন্দপুরের ফালু সরকারের পোলা হেলাল সরকার মাঝে মধ্যে বজরায় চড়ে গাঙ দিয়ে যায়, তখন তার বজরা হতে এই ধরনের গান ভেসে আসে। কলে গান করে। তবে কলের গান মেশিনটি গায়ের লোক জীবনেও দেখে নাই। কিয়ামুদ্দি সরকারের বাড়ী হতে ঠিক সেই রকম গান ভেসে আসছে। হুবহু একই গলা একই গান - 'এতরাতে কেন ডাক দিলি প্রাণ কোকিলা রে......'।
বিষয়টা কি ? পড়ি মরি করে ছুটলাম। গায়ের সব বাড়ী হতে লোকজন ছুটে আসছে। সরকার বাড়ী লোকে লোকারণ্য। কোনমতে দেখতে পেলাম - একটি ছোট বাক্সমতো জিনিষের উপর একটা গোল চাকতি ঘুরছে। সেই চাকতির উপর একটি চোঙ্গা ঘাড় কাত করে ছুয়ে আছে, আর তাতেই সেই বাক্স হতে অপুর্ব সব গান বেরিয়ে আসছে - 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে', 'ওকি গাড়িয়াল ভাই, কতো

রব আমি’...আরো কতো গান। শীলু বুজির জামাই একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন এবং মাঝে মাঝেই একটা হ্যান্ডেল ঘুরাচ্ছেন।

শীলু বুজির জামাই ধনী লোক। কলের গানটি তিনি নুতন কিনেছেন এবং কিনে প্রথমেই শশুর বাড়ী। গায়ের সমস্ত লোক এমন কি বৌ ঝি’রা পর্য্যন্ত হামলে পড়েছে। এতবড় কান্ড নামাশুলাই গ্রামের জীবনে ঘটে নাই। গান-বাজনা হারাম বলে ফতোয়া দানকারী কলিমউদ্দিন মুন্সীকেও দেখা গেল গম্ভীরমুখে গরুকে পানি খাওয়াচ্ছেন। তিনি তো আর ইচ্ছে করে গান শুনছেন না, আল্লাহর দেয়া কানে যদি কোন শব্দ ঢুকে যায় তিনি তা রোধ করবেন কীভাবে ? কানে তো আর তুলা গুঁজে রাখা যায় না। নসু বয়াতির বাঘের মত বড় বড় মোচের নীচ হতে ভেসে আসে- ‘বাহ্ বাহ্, কী গান। কইলজা ঠান্ডা হইয়া গেল’। কেউবা বলে - ‘মাইনষের হিকমত খুবই বাইরা গেছে, রোজ কিয়ামতের আর বাকী নাই’।

আমি খুবই বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। মায় নাই, মানুষ নাই, ঢোল তবলা কিছুই নাই - একটা বাক্সের ভেতর থেকে কথা বের হয় কীভাবে ? তা’হলে কি যাদু করে বাক্সের মধ্যে মানুষ ভরে দেয়া হয়েছে ? মজু বলল- ‘আনাম মানুষ ভরার দরকার নাই, মাইনষের রক্ত আর জিবলা যাদু কইরা বাক্সের মধ্যে ভইরা রাখে, তারাই গান করে’।

হবি স্বল্পবাক হলেও মাঝে মাঝে আঁতেলের মতো কথা বলে। সে এতক্ষন নিবিষ্টমনে গান শুনেছে, এইবার বলল- ‘ইডা খিরিস্তানগো কান্ড, এই গান যারা শুনব তারা হাবিয়া দোজখে যাইব’।

হবির কথায় কাশেম খুব অসন্তুষ্ট হয়। সে বলে- ‘যা যা, আমরা হাবিয়া দোজখেই যামু, তাতে তর কী ? তুই এখানে খারাইয়া রইছস্ ক্যান, বাড়ীত্ যা’। কাশেমের কথার পরও হাবিবউল্লাহর স্থানত্যাগের কোন লক্ষন দেখা গেল না। সে আগের মতোই নিবিষ্টমনে গান শুনে যেতেই থাকল।

এত বড় মেয়ে মোটে কেলাশ টু’তে পড়ে কেউ বিশ্বাস করবে ? লম্বায় প্রায় আমার সমান। আমি থিরিতে পড়ি, তারাবানু মোটে টু’তে। কম্ ছে কম্ থিরিতে পড়া উচিত ছিল। মেয়েটি পরীর চেয়েও বেশী সুন্দরী, এত সুন্দর মুখ জীবনে দেখি নাই। তারাবানুকে দেখে প্রথম দিনই ঘায়েল হয়ে গেলাম, এ্যাক্কেবারে খুন। কীভাবে ওর সাথে ভাব জমানো যায়, কীভাবে একবার কথা বলা যায় দিনরাত সেই চেষ্টা। অথচ আমি এমন মুখচোরা যে সে যদি কখনও আমার সাথে কোন কথা বলে, ভালমত জবাব দিতে পারি না।

ভাটিপাড়ার রফিক আমার পরম বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, পরম ভক্তও। আমি ক্লাশের সেরা ছাত্র, রফিক সবচেয়ে নিস্বা। এই সুবাদে প্রায়ই তার কান মলতে হয় আমাকে। খুব আস্তে আস্তে কান মলি যেন সে কোন কষ্ট না পায়। এজন্য সে আমার নিকট কৃতজ্ঞ। বলে- ‘তমছের হারামজাদা কান মললে কানডা সারাদিন বিষ করে। খাড়া, গুটু খেলায় একদিন কায়দামত পাইলে হয়, অর হাত মুচড়াইয়া ভাইংগা দিমু’।

আমি বলি - ‘পড়া শিখা আসছ না ক্যান, পড়া শিখা আসলেই তো আর কানমলা খাইতে হয় না। হেদিন সকলের সামনে তরে প্যারিমোহন স্যার কপালে চাড়া দিয়া রৌদ্রে দাড় করাইয়া রাখল তর শরম করল না’?

রফিক বলে- ‘পড়ি তো। একটু পরেই ভুইলা যাই তার আমি কি করুম’?

আগের দিন অষ্টমীর মেলা হতে জাভা চিনির তৈরী অনেক ঘোড়া মটুক আনা হয়েছিল। তার দুইটা পকেটে করে স্কুলে নিয়া যাই, তারাবানুকে দিতে হবে। তার সাথে খাতির জমানোর আর কোন রাস্তা ছিল না, সুতরাং প্রাণে ধরে এই অমুল্য জিনিষ তাকে দিতে হবে। কী আর করা ?

টিফিনের সময় এক ফাকে তারাবানুকে বললাম- ‘তারাবানু, ঘোড়া মটুক খাবি’?

সে আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর নির্বিকার ভাবে আমার হাত হতে মিষ্টান্ন দু’টি নিয়ে খেতে শুরু করল। একটু ধন্যবাদ না, একটু কৃতজ্ঞতা না। ভেবেছিলাম মিষ্টি দুইটা খাওয়ার পর সংগতভাবেই সে আমার সাথে থাকবে আমার সাথে খেলবে, কিন্তু আমার আশা বিন্দুমাত্র পুরণ হলো না। আগের মতোই আমার দিকে ফিরেও চায় না সে। আমরা যখন গোল হয়ে দাড়িয়ে নামতা পড়ি, তখন সবসময়ই সে তমছের, লেহাজুদ্দিন কিংবা মফের পাশে দাড়ায়, তাদের কাঁধে হাত রেখে নামতা পড়ে। একদিনও আমার পাশে দাড়ায় না।

আমার প্রতি তারাবানুর এই অনীহার কারণ কী ? আমার বাপ বিখ্যাত লোক, গায়ের সবাই যাকে মানে। আমি ছাত্র হিসেবে তুখোড়, প্রতিবছর ফার্স্ট হই। দেখতেও সুন্দর। তা'হলে ? কেন তারাবানু আমার প্রতি বিমুখ, কেন আমার দিকে ফিরেও তাকায় না ?
কারণ খুজতে গিয়ে যে সম্ভাবনাটি সবচেয়ে বেশী উজ্জল হয়ে দেখা দিল- তা আমার ডান পা'য়ের ঘা'টি। শীত আসলেই আমার পায়ে ঘা হয় - সবাই বলে বিখাউজ। কোন ওষুধপত্রেই এই ঘা সারে না। এমন কোন টোটকা নাই যা মা বাদ রেখেছেন। টাকি মাছের মলম, বীচা কলার তৈরী মলম, বিখ্যাত ঢোল কোম্পানীর মলম সব ফেল। অবশেষে কেস্ট ফকির বিধান দিলেন- 'দিষ্টি লাগছে, ধারানি দেওন লাগব'।
সপ্তাহ ধরে মহাসমারোহে ধারানির আয়োজন চলল। মা'র কোলে বসে বহু কস্ট করে মন্ত্রপড়া গরম পানির ধারানি সহ্য করলাম, কিন্তু বিখাউজ অজর অমর হয়ে টিকে রইল। এমতাবস্থায় উত্তরবাড়ীর বাছিরনের মা এগিয়ে আসলেন। বললেন- 'আর কোন পথ নাই বউ। পাজী বিখাউজ, একমাত্র কুত্তা দিয়া চাটাইলে যদি যায়'।
কুত্তা দিয় 'ঘাও' চাটানোর পন্থাটি এমনই অভিনব যে মা পর্য্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। তবে সন্তানের রোগমুক্তির জন্যে মা'য়েরা সবকিছুই করতে পারেন। আমাদের পোষা নেড়ি কুত্তাটি কিছুতেই ঘা' চাটতে রাজী হলো না। তাকে আদর তোয়াজ করে বহুবার চেষ্টা করা হলো - ঘা'য়ে নাক লাগিয়ে কয়েকবার শুকল পর্য্যন্ত - কিন্তু জিভ লাগাতে রাজী হলো না। জাতে কুত্তা হলেও প্রেষ্টিজ-জ্ঞান টনটনে - তা বুঝা গেল। এখন উপায় ?
বাছিরনের মা বললেন- 'এমনে হইব না। মাছের ভর্তা বানাও, হেই ভর্তা ভাল কইরা পায়ে মাখাও। তারপর দেখবা কুত্তায় কেমুন চাইটা চাইটা খায়'।
বাছিরনের মা'র পরামর্শ ভালই ছিল, কুত্তায় চেটেপুটে খেয়ে নিল সব, তবে আমার বিখাউজের কোন উন্নতি হলো না। আগের মতোই তা আমার অংগের ভুষণ হয়ে টিকে রইল।
বিখাউজ আমার জীবনযাত্রায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে নাই। পায়ে পট্টি জড়িয়ে খেলাধুলা, লেখাপড়া সবকিছুই নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রমাদ ঘটাল তারাবানু। সামান্য একটা বিখাউজের জন্য সে আমাকে বাতিল করে দিল।
গরম কাল আসলে আমার ঘা সেরে যাবে, পা হয়ে যাবে তেলতেলা। তখন ? তারাবানু নিশ্চয়ই আমার সাথে ভাব জমাতে আসবে। কিছুতেই পাত্তা দেব না তাকে। আমাকে অবহেলা করাটা যে তার মারাত্মক ভুল হয়েছে এই সত্যটা উপলব্ধি করুক সে। পরীক্ষায় আমি একশ'র মধ্যে একশ' পাব। সবাই আশ্চর্য্য হবে, আমার সাথে খাতির জমাতে আসবে। সবার সাথেই হাসিমুখে কথা বলব, কিন্তু তারাবানুর দিকে ফিরেও তাকাব না। আমার অবহেলায় সে কীরূপ অনুতপ্ত হবে, তার চোখে পানি এসে যাবে - সেই কল্পনা করে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলাম এবং আমার চোখেই পানি এসে গেল।

মানুষ যা ভাবে তা ঘটে না। তারাবানু আর স্কুলে আসে না। প্রতিদিন পথ চেয়ে থাকি, কিন্তু তারাবানুর দেখা নাই। ভীষণ মনোকষ্টে পড়ে যাই আমি। রফিক আর তারাবানু এক পাড়ায় থাকে। দু'দিন ধরে রফিকও আসে না, বিষয়টা কী ?
মফে বলল- 'এল্লা জানস্ না, তারাবানুর বিয়া। রফি তারাবানুর বিয়া খাইতে গেছে'।
তারাবানুর বিয়া ! আর কোনদিন তারাবানুকে দেখতে পাব না, আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসে।
মফে বলল- 'তারাবানুর জামাই পুলিশ, কনেষ্টবল। হারপাটা দিয়া থুবাইয়া টেকা আনে, জানস্'।
বিদায় তারাবানু, বিদায়। স্কুলে আসলে আর কোনদিন সেই সুন্দর মুখটা দেখতে পাব না, মিষ্টি হাসি দিয়ে আর মন ভরিয়ে দেবে না কেউ । এই স্কুলে আমি আর পড়ব কীভাবে ?
মফে বলল- 'মেজর। গোড়াই রাস্তা বান্ধনের লাইগা কোদাইলা গাড়ী আসছে ? যাবি'?
গোড়াই পাহাড়ের উপর দিয়া নাকি ঢাকা-টাংগাইল রাস্তা হচ্ছে। সেখানে আজব আজব সব যন্ত্র এসেছে। কিন্তু গোড়াই বহু দুরে, কম করে হলেও পাঁচ মাইল তো হবেই। এতদুরে আমরা দুইজন পোলাপান মানুষ কীকরে যাব? মা আমাকে কালিয়াকৈর পর্য্যন্ত যেতে দেয় না।

মফে বল- 'ফুঃ। গোড়াই একটা দুর হইলো ? আমি একলা মির্জাপুর পর্য্যন্ত যাই, একদিন হাসপাতাল দেকপার গেছিলাম'।
মফে চালিয়াত ছেলে, নানা অকাম-কুকাম করে প্রায়ই মার খায়। তবুও তার আজকের আমন্ত্রণ অবহেলা করা বড়ো কঠিন। দ্বিধা কাটিয়ে অবশেষে মফের হাত ধরে রওনা হয়ে যাই।

শীতকাল শেষ হয়ে গেছে, পথঘাট শুকনা খটখটা। তুরাগের পাড় ধরে আমরা দুই অভিযাত্রী গোড়াই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। মনে বাঁধন ছেড়ার উল্লাস। কুতুবদিয়া পৌছে একটা নূতন দৃশ্য দেখে সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। ওগুলো কী ?
গাছ-গাছালির উপর দিয়ে কালিয়াকৈরের দিগন্ত হতে গলগল করে ধুয়া বেরুচ্ছে। সেই ধুয়ায় আকাশ বাতাস কালো হয়ে যাচ্ছে। কোন আগুন নাই, শুধু ধুয়া। আমি বহুবার কালিয়াকৈর এসেছি, কিন্তু এরূপ কখনও দেখি নাই। ভুগোল বইতে পড়া ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি আর পম্পাই নগরী ধ্বংসের কাহিনী মগজে টাটকা। এই মুহূর্তে সেখানে কোন আগ্নেয়গিরি তৈরী হয় নাই তো ? লোকজনেরা টের পেয়েছে তো ?
আমরা সভয়ে দাড়িয়ে পড়লাম, আর এগুনো ঠিক হবে না। আমি বললাম- 'নিচ্যয়ই একটা অগ্নিগিরি, বিসুবিয়সের লাহান। লোকেরা টের পাইছে কিনা কে জানে'।
মফে আমার চেয়েও বেশী ভয় পেয়েছে, সামনে এগুবো না পিছু হটবো ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। আগ্নেয়গিরি হলে লোকজনের চিকড়াচিকড়ি শুনা যাওয়ার কথা, কিন্তু সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না।
হাতে দুধের দোনা নিয়ে এক লোক বাজার করে ফিরছিল। আমাদের জড়োসরো হয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে বললো- 'সোনারা, এখানে এমুন কইরা খারাইয়া আছ ক্যান্। কই যাবা'?
আমরা বললাম- 'আমরা গোড়াই কোদাইলা গাড়ি দেকপার যাইবার চাইছিলাম। আইচ্ছা, অই যে কালা ধুমা বাইর হইতেছে ঐগুলা কী'?
লোকটি বলল- 'ঐগুলা ? ঐগুলা ইটের ভাটা, রাস্তার লাইগা ইট পোড়াইতেছে। রাস্তায় অনেক ইট লাগবো তো, তাই ছি.এন.বি. ইটের কল বসাইছে। যাও, কুন ডর নাই...'।
যাক্ রক্ষা, ধরে প্রাণ ফিরে আসে আমাদের। বিপুল উৎসাহে আবার রওনা দেই। রাস্তা বান্ধা দেখতে গিয়া যদি ইট বানানোর কল দেখতে পারি তা'হলে তো লাভের উপর আঠারো আনা।
গোড়াইর উদ্দিষ্ট স্থানে যখন পৌছলাম তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। আজব কান্ড । হাতেম তাই'র পুথি কিংবা আরব্যোপন্যাসের সেই দেও আমাদের সামনে। লাল রংয়ের একটা গাড়ীর উপর স্বপ্নের রাজকুমারের মতো একজন লোক বসে আছে, মাথায় হ্যাট, চোখে কালো চশমা। গাড়ীর সাথে মস্ত বড়ো এক কোদাল ফিট করা, তা আবার ইচ্ছেমতো উপর-নীচ করা যায়। সেই কোদাল মাটিতে ঠেকিয়ে দাতাল শুয়রের মতো চাপ দেয়, মুহূর্তের মধ্যে মাটি, গাছ, গাছের শিকড় সব সরে গিয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে যায়। কত বড় চাকা, কী অসম্ভব জোর ! বহুলোক জড়ো হয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখছে। এটাকে নাকি 'বুলডজার' বলে। মগ্ন হয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম বহুক্ষন, মন-প্রাণ ভরে গেল। আহ্, বড় হয়ে যদি বুলডজারের ড্রাইভার হতে পারতাম।

বিকেল হয়ে আসছে, এবার ঘরে ফেরার পালা। বেশ কিছু পথ জংগলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। চারদিকে জংগল, তার মাঝ দিয়ে লাল মাটির আঁকাবাঁকা পথ। আসন্ন সন্ধার ম্লান আলোয় দুইজন কিশোরের পক্ষে সেই রাস্তায় হাটা ভয়ের কথাই বটে। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিলাম, কী একটা দৌড়ে যেয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। সারা গা হতে কাটার মতো কী যেন খাড়া হয়ে আছে।
মফে বলল- 'ডরাইস্ না। ওডা শজারু। আমাগো দেইখা ডর খাইয়া জংগলে ঢুইকা গেল'।
চারদিকে শাল-গজারি গাছগুলি নিঃশব্দে দাড়িয়ে আছে। আচ্ছা, আমাদের খুশী মুখ দেখে গাছেরা কি বেজার হয়েছে ? শুনেছি গাছেদেরও প্রাণ আছে, তারাও অনুভব করতে পারে। আজ কোদালে গাড়ীর চাকার তলায় কত গাছ উপড়ে গেল। ইটের ভাটা হয়েছে, তার আগুনে পেটে আরও কতো গাছ উজাড় হয়ে যাবে। হয়ত এখানে আর গাছ-গাছালি থাকবে না, থাকবে না বাঘ, হরিণ, বানর, শাজারু, শুয়র আর হাজারো পাখীদের ঝাক। শহর বসবে, পাকা রাস্তা হবে, ইলেকট্রিক বাতি আসবে।

তারাবানুর মুখের হাসিটির মতো বন্য প্রকৃতিও চিরদিনের মতো বিদায় নেবে। নগর সভ্যতার অগ্রদূত ইটের ভাটা ও বুলডোজার এসে গেছে। তাদের দাপট দেখে ছোট্ট দু'টি কিশোর অভিভূত হয়েছে। সেজন্যেই কি বন এমন বিমর্ষ ভাব ধারণ করেছে ?
জংগল শেষ হয়ে এলো। আমরা যখন সমতলভূমিতে নামলাম তখন পশ্চিমাকাশ লালে লাল, সূর্য্য পাটে যেতে বসেছে। সামনে আরও তিন মাইল রাস্তা। তুরাগ পার হয়ে উত্তর দিকে তাকালাম। মাঠের অপর পাড়ে কালো একটি গ্রাম দিগন্তের কোলে মুখ লুকিয়ে আছে। মফে বলল- 'ঐ যে গাঁওটা দেখছস্ না, অর নাম কুড়িপাড়া। তারাবানুর ঐ গাঁয়ে বিয়া হইছে'।
মফের কথায় আবার তারবানুর স্মৃতি মনে পড়ল। আশ্চর্য্য, এখন আর ততটা খারাপ লাগছে না। অজানাকে জানার অদেখাকে দেখার আনন্দ মন হতে সমস্ত বিষাদ কখন নিঃশেষে মুছে দিয়েছে। তারাবানুর চেয়ে বরং মায়ের কথাই বেশী করে মনে পড়ছে। জীবনে এই প্রথম মাকে না বলে এতদুর চলে এসেছি, না জানি এতক্ষনে মা কীরূপ উতলা হয়ে উঠেছে। খুব জোরে হাটতে থাকি আমরা।

কুতুবদিয়া যখন পৌছলাম তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনেই কুতুবদিয়ার বিখ্যাত চিতাখোলা। কুতুবদিয়ার চিতাখোলা বড় ভয়ংকর জায়গা, কত মানুষ যে এখানে ভুতপেত্নীদের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্বা নাই। বড় মানুষেরাই রাতের বেলা চিতাখোলার পথ ধরে না, আমরা দু'জন ছোট মানুষ সেস্থান কীভাবে পার হব?
মফে বলল- 'কুলহু আল্লাহর ছুরা জানস্, কুলহু আল্লাহ পড়। কুলহু আল্লাহ পড়লে ভুতপেত্নী সামনে আসে না'।
ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছি, পাশেই অভয়চরণ মন্ডলের বাড়ী। নদীর ঘাটের দিকে তাকাতেই আমার কলজেটা ধক্ করে উঠল। একজন লোক জবুথবু হয়ে জলের কিনারে বসে আছে। লোকটা এতরাতে ওখানে বসে আছে কেন ?
ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসছে, সামনে চলার একবিন্দু শক্তি নাই।
মফে প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠে- 'কেডা, আপনে কেডা'?
কোন জবাব নাই। উপরে নীল আকাশে অগনিত তারা, পাশে তুরাগ আপন মনে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্রম্মান্ডে আর কোন শব্দ নাই। নীরব নিথর।
ভয়ে আমাদের কালঘাম ছুটে গেছে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসি আমরা, তারপরই প্রাণপনে অভয়চরণ মন্ডলের বাড়ীর দিকে দৌড় লাগাই।
আমাদের সমবেত চীৎকারে বাড়ীর সকলে বেরিয়ে আসল। আমরা তখন উঠানে বসে হাপাচ্ছি। আমাদের দেখে মন্ডল তো অবাক। বলল- 'খোকারা, তোমরা এত রাতে কই থেইকা আসছ, কই যাবা'? অভয়চরণ মন্ডলের ছোট ছেলে সুরেন আমার পরিচিত, সে বলল- 'ও নামাশুলাই'র জেহার সরকারের পোলা, আমাগো ইস্কুলে পড়ে'।
সব বৃত্তান্ত শুনে মন্ডল বলল- 'ডরাইও না বাপধনেরা, ডরের কিছু নাই। ডরের চোটে তোমরা নিচ্যয়ই চোখে খুয়া দেখছ। মিহির, হারিকেনডা লইয়া যা তো, অগো বাড়ীত পৌছাইয়া দিয়া আয়। পোলাপান মানুষ, এতরাতে বিল পার হইতে পারব না'।
একজন বৃদ্ধা কাঁশার গ্লাশে পানি নিয়ে এসে বলল- 'লবন জল খাও বাবারা, লবন জল খাও। নইলে ডরফুকনা হইবো'।
তিনি আমাদের আদর করে লবন-জল খাওয়ালেন, নইলে নাকি ডরফুকনা হয়ে মানুষ মারা যায়।
মিহির নামের ছেলেটি আমাদের সহগামী হলো। নদীর ঘাটে এসে আমরা দাড়িয়ে পড়লাম, জলের কিনারে সেই বুড়াটা এখনও ঠিক একইভাবে বসে আছে, একবিন্দু নড়াচড়া করে নাই।
সব দেখেশুনে মিহির হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হাত হতে হারিকেনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে নির্ভয়ে নদীর পাড় বেয়ে নীচে নেমে গেল। আশ্চর্য্য ! লোকটিকে দুই হাতে উঁচু করে ধরে সে সবলে নদীতে ছুড়ে ফেলল।
মানুষ না, একটা মুর্তি। দিনকয়েক আগে হিন্দুরা সুবচনীর পুজা করেছে, পুজা করে মুর্তিটা নদীর পাড়ে ফেলে রেখে গেছে। রাতের আঁধারে ভয়ার্ত বালকের চোখে তা অবিকল মানুষের মুর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজ-পাড়াগায়ের ছেলেটি গুরুজনদের আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা না করে কীসের নেশায় বেরিয়ে পড়ে, সে এক চিরন্তন রহস্য। অজানাকে জানার অদেখাকে দেখার যে আদিম কৌতূহল প্রতিটি মানবশিশুর মনে ঘুমিয়ে আছে, সেই কৌতূহলই পরবর্তী জীবনে কাউকে কলম্বাস বানিয়ে অতলান্ত সাগর অতিক্রম করতে উদ্বুদ্ধ করে, কাউকে বা নীল আর্মষ্ট্রং হিসেবে চাঁদের বুকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কলম্বাস আর আর্মষ্ট্রংদের সাথে মুলতঃ মফে-মেজরদের কোন তফাৎ নাই।

মেজবাহ উদ্দিন জওহের

মে-২০০৫